গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা | ২৮ জুন - ৪ জুলাই ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

এমএসপি বৃদ্ধির নামে কেন্দ্রীয় সরকারের মিথ্যাচার

দিল্লির কৃষক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল কৃষিজ দ্রব্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) আইনসঙ্গত করা ও যথার্থ উৎপাদন খরচের দেড় গুণ দাম নিশ্চিত করা। নরেন্দ্র মোদি সরকার আন্দোলনের চাপে এই দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু সেই আশ্বাস তারা পূরণ করেনি। এর ফলে বিগত নির্বাচনে বিজেপি কৃষকদের প্রবল ক্ষোভের মুখোমুখি হয়েছে এবং অন্তত ১৫৯টি আসনে কৃষকরা বিজেপির পরাজয় নিশ্চিত করেছে।

কিন্তু এখানেই কৃষকরা চুপ করে বসে থাকবে না। তারা তাদের দাবি আদায়ের জন্য আবার মরিয়া সংগ্রামে নামতে বদ্ধপরিকর। আবার তারা পথে নামার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইতিমধ্যেই এ আই কে কে এম এস ভারতজুড়ে এমএসপি-র দাবিতে পথে নেমেছে। অন্যান্য কৃষক সংগঠনও পথে নামার জন্য তৈরি হচ্ছে। সংযুক্ত কিসান মোর্চা সংগ্রাম ঘোষণা করেছে। ফলে আতঙ্কিত বিজেপি সরকার কৃষকদের প্রতারিত করার জন্য খরিফ ফসলের সংগ্রহ মূল্য খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে তারস্বরে প্রচার করছে— এই দেখো, আমরা কৃষকদের এমএসপি-র দাবি মেনে নিয়েছি, আমরা উৎপাদন খরচের দেড় গুণ দাম দিচ্ছি। ভাবখানা এমন যে, দেখো মোদি সরকার কত কৃষকদরদি!

বিজেপি সরকারের এই দাবি যে কত ভ্রান্ত তা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়।

ধানের কথাই ধরা যাক। প্রকৃত উৎপাদন খরচের দেড় গুণ দাম যদি দিতে হয় তাহলে ধানের দাম কত ধার্য করতে হবে? কমিশন ফর এগ্রিকালচারাল কস্ট অ্যান্ড প্রাইসের (সিএসিপি) হিসাব অনুযায়ী, দাম দিতে হবে

দুয়ের পাতায় দেখুন

মূল্যবৃদ্ধি রোধ, নিট-নেট দুর্নীতির তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে কলকাতায় বিক্ষোভ

দুধ, আলু, সব্জি সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে চলছে এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ, স্কোয়াড, পথসভা। ছবি ঃ বরানগর। ২৩ জুন

নিট সহ লাগাতার প্রশ্ন ফাঁসে দোষীদের শাস্তি ও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে এআইডিএসও-র বিক্ষোভ। প্রেসিডেন্সি কলেজ গেট। ২০ জুন

হিমঘরে আলু মজুত রেখে সরকারের মদতে দাম বাড়াচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ী চক্র

এই প্রতিবেদন লেখার সময় খুচরো বাজারে আলুর দাম ৩৪ টাকা কেজি। কেন এত দাম? বাজার অর্থনীতি বলে, জোগান কম হলে কিংবা চাহিদা বাড়লে পণ্যের দাম বাড়ে। কিন্তু এই সময়ে আলুর চাহিদা হঠাৎ বাড়েনি। তাহলে জোগান কমের জন্যই কি দাম বেড়েছে?

জোগান কী ভাবে কমতে পারে? এক, আলুর উৎপাদন কম হলে, দুই, যথেষ্ট উৎপাদন হলেও তা মজুত করে রাখলে। আলুর ক্ষেত্রে ঠিক দ্বিতীয়টাই ঘটেছে। এ রাজ্যের হিমঘরে যথেষ্ট পরিমাণ আলু মজুত আছে। এক শ্রেণির বড় ব্যবসায়ী হিমঘরে মজুত আলু ধরে রেখে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছে। আর এই সুযোগে মাত্রাছাড়া দাম বাড়িয়ে বিপুল মুনাফা করছে তারা।

হিমঘরগুলি তৈরি হয়েছে কৃষকের উৎপাদিত আলু সংরক্ষণের জন্য। কিন্তু বাস্তবে এখন হিমঘরে কৃষকের আলু থাকে সামান্যই। প্রতি বছরই আলু উৎপাদনের সময় হিমঘরগুলো খুলতে দেরি করে। কৃষকের ওই সময় ঋণ মেটানোর তাগিদ থাকায় তাদের পক্ষে আলু ধরে রাখা সম্ভব নয়। এই সুযোগে এক শ্রেণির ব্যবসায়ী শাসক দলের নেতা এমএলএ-এমপিদের নানা উপঢৌকন দিয়ে, হিমঘর মালিকদের সঙ্গে যোগসাজশে বেশির ভাগ বন্ড হাতিয়ে নেয়। ব্যবসায়ীরা হিমঘর যতদিনে খোলে, কৃষকের ঘরে তত দিনে আর আলু থাকে না। আলু যতদূর সম্ভব কম দামে কিনে ব্যবসায়ীরা এইসব হিমঘরে মজুত করে। তারপর সারা বছর ধরে কম কম করে আলু বাজারে আনে। এ ভাবে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে আলুর দাম বাড়িয়ে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে তারা।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে সরকারের কি কোনও ভূমিকা নেই? রাজ্যে

দুয়ের পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তাব্যক্তিরা জড়িত না থাকলে তদন্তে ভয় কেন

তৃতীয় দফায় সরকার গঠনের পর থেকে একের পর এক কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠে চলেছে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে। এমনই একটি হল এক্সিট পোল-শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি। অভিযোগ— ভোটের ফল প্রকাশের আগে ভুয়ো এক্সিট পোলে বিজেপি তথা এনডিএ জোটের বিপুল জয় দেখিয়ে শেয়ার বাজারে শেয়ারের দাম চড়ানো হয়েছিল। ফল প্রকাশের পর বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সেই চড়া শেয়ার বাজার ধসে পড়ে। এর ফলে এক দিকে প্রচুর পরিমাণে মুনাফা লোটার সুযোগ পেয়েছে পরিচয় লুকানো কিছু কোম্পানি তথা মালিক, অন্যদিকে বিপুল ক্ষতির শিকার হয়েছে শেয়ার বাজারের সঙ্গে যুক্ত সাধারণ মানুষ। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে নাম জড়িয়েছে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর।

এক্সিট পোল-শেয়ার কেলেঙ্কারি

জানা গেছে, ৩১ মে শেষ দফা নির্বাচনের দিন শেয়ার বাজারের কার্যকলাপ আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ কোনও কারণ ছাড়াই ব্যাপক ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এনএসই (ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ)-তে সেদিন আগের দিনের তুলনায় দ্বিগুণ মূল্যের শেয়ার কেনাবেচা হয়েছিল, যা সাধারণত ঘটতে দেখা যায় না। কিছু বিদেশি বিনিয়োগকারী সেদিন বিপুল পরিমাণ শেয়ার— মোট বিক্রি হওয়া শেয়ারের ৫৮ শতাংশ— কিনে নিয়েছিল। ঠিক তার পরদিন ১ জুন থেকে সংবাদমাধ্যমগুলি এক্সিট পোল প্রচার করতে শুরু করে। এবারের প্রতিটি এক্সিট পোলেই বিজেপি তথা এনডিএ

দুয়ের পাতায় দেখুন

রেল দুর্ঘটনা ঃ কর্মীর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে ব্যর্থতাকে আড়ালের চেষ্টা

বাহানাগা বাজার স্টেশনে করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় তিনশো যাত্রীর মৃত্যুর দুঃসহ স্মৃতি মুছতে না মুছতেই শিলিগুড়ির কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনা জনমানসে গভীর বেদনার সঞ্চার করেছে। ইতিমধ্যে আরও কিছু রেল দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, যা বিশেষ প্রচার পায়নি। রেলমন্ত্রক যথারীতি দুর্ঘটনায় মৃত মালগাড়ির চালকের ওপর দুর্ঘটনার সমস্ত দায় চাপিয়ে অব্যাহতি পেতে চাইছে। করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনাতেও রেলমন্ত্রী সহ রেলমন্ত্রকের কর্তাব্যক্তিরা একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দায় ঝেড়ে ফেলা যেতে পারে। তাতে দায়িত্ব অস্বীকার করা হয়। কিন্তু মূল সমস্যাগুলি চাপা পড়ে যায়। ফলে একই জিনিস বারবার ঘটে। সাধারণ মানুষের প্রাণ যায়। নেতা-মন্ত্রীদের কুম্ভীরাশ্রু রেলযাত্রা নিরাপদ করতে পারে না। তাই গত তিন বছরে ২০টির-ও বেশি রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রাণ গেছে রেলকর্মী সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষের। নেতা মন্ত্রীরা দায়িত্বশীল হলে সমস্যার গভীরে ঢোকার চেষ্টা করতেন। তার সমাধান করার চেষ্টা করতেন। তা না করে ড্রাইভারের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে পার পেতে চাইছেন। কিন্তু মালগাড়ির আহত সহকারী চালকের

সাতের পাতায় দেখুন

কর্তাব্যক্তিরা জড়িত না থাকলে তদন্তে ভয় কেন

একের পাতার পর

জোটের বিপুল জয়ের আগাম ঘোষণা করা হচ্ছিল। এর প্রভাবে সপ্তাহান্তের দু'দিন ছুটির পর ভোটের ফল ঘোষণার আগের দিন ৩ জুন, সোমবার দেখা গেল বাজারে শেয়ারের দাম উল্লেখযোগ্য রকমের চড়া। যে বেনামী বিদেশি কোম্পানিরা ৩১ তারিখ শেয়ার কিনেছিল, তারা চড়া বাজারে নিজেদের শেয়ার বিক্রি করে দিয়ে বিপুল মুনাফা করে নেয়। আর আগামী দিনে শেয়ারের দাম আরও বাড়বে এই আশায় সেগুলি দ্রুত কিনে নেয় সাধারণ ক্রেতারা। সেদিন শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল বিপুল— ১২.৪৮ লক্ষ কোটি টাকা। পরদিন ৪ জুন ভোটের ফলাফলের সঙ্গে এক্সিট পোলের ফারাক যখন প্রকট হয়ে উঠল, বিজেপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সম্ভাবনা যত কমতে থাকল, দেখা গেল শেয়ারের দাম ব্যাপক ভাবে পড়ে যেতে শুরু করেছে। বাজারে ধস নেমে ওই দিন অর্থাৎ ৪ জুন ৩০ লক্ষ কোটি টাকা হারান লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা। ৩১ মে দেদার শেয়ার কিনেছিল যারা, ততক্ষণে তারা বিপুল মুনাফা লুটে নিয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে, কী কারণে ৩১ মে— এই একটি মাত্র দিনে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এত শেয়ার কিনেছিল? এর আগে কখনও এমন ঘটনা তো ঘটতে দেখা যায়নি! তবে কি আগে থেকে বিশেষ কিছু বিনিয়োগকারীর কাছে খবর চলে এসেছিল যে পরদিন থেকে এক্সিট পোলগুলি একই সুরে বিজেপির বিপুল জয়ের কথা প্রচার করতে থাকবে এবং তার জেরে শনি-রবি ছুটির পর ৩ জুন বাজার খুললে দেখা যাবে এক ধাক্কায় শেয়ারের দাম রেকর্ড ভাঙা উচ্চতায় পৌঁছেছে? তবে কি কৃত্রিম উপায়ে শেয়ারের দাম চড়িয়ে কিছু বিনিয়োগকারীকে মুনাফা লোটার সুযোগ দিতে প্রতিটি এক্সিট পোলে বিজেপি তথা এনডিএ-র হয়ে মিথ্যা প্রচারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল? এই বিদেশি বিনিয়োগকারীরা কারা— এ প্রশ্নের উত্তরে বলে রাখা ভাল যে, মরিশাসের মতো কর-ফাঁকির স্বর্গরাজ্য থেকে বহু সময়েই বিদেশি মুখোশ পরে ভারতীয় বৃহৎ একচেটিয়া কারবারিরা কাজ চালায়। অবশ্য কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের মতে, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা নয়, খুচরো শেয়ার কারবারিদের আড়ালে থাকা দেশেরই বড় ব্যবসায়ী সংস্থাগুলিই এই ঘটনা থেকে মুনাফা লুটেছে।

এই পরিস্থিতিতে ক্ষতির মুখে পড়া ছোট বিনিয়োগকারীরা দাবি তুলেছেন, সরকারকে এই বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আসল পরিচয় প্রকাশ করার ব্যবস্থা করতে হবে। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি)-র কাছে তাঁদের দাবি, কাদের হয়ে কাদের টাকা ৩১ মে তারা শেয়ার বাজারে খাটিয়েছিল, সেই নামগুলি প্রকাশ্যে আনতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ— এক্সিট পোলগুলি একযোগে বিজেপির হয়ে মিথ্যা প্রচার না করলে, শেয়ারের দাম এত চড়ে যেত না এবং ৪ জুন সমস্ত পূর্বানুমান ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর তাঁদের এই বিপুল ক্ষতির মুখেও পড়তে হত না। তাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, কাদের স্বার্থে এ হেন এক্সিট পোলের ভুয়ো প্রচার হল? ছোট বিনিয়োগকারীদের রেকর্ড পরিমাণ ক্ষতির মুখে ঠেলে দিয়ে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নামে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যবসায়ীদের বিপুল মুনাফা লোটার ব্যবস্থা করে দেওয়ার কেলেঙ্কারির উপযুক্ত তদন্ত চাইছেন তাঁরা।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই এক্সিট পোল-শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারিতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ বিজেপির আরও কয়েকজন বড় নেতার যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। লোকসভা ভোট চলাকালীন ১৩ মে মোদি ঘনিষ্ঠ কর্পোরেট আদানি সাহেবের মালিকানাধীন এনডিটিভি চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, "৪ জুনের আগে আপনাদের শেয়ার কিনে রাখার পরামর্শ দিচ্ছি, কারণ তার পরে শেয়ারের দাম বাড়বে।" এর পর ১৯ মে ওই একই টিভি চ্যানেলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন— ৪ জুন শেয়ার বাজার সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে। অর্থাৎ বিজেপি সরকারের দুই প্রধান কর্তা দেশের মানুষকে খোলাখুলি শেয়ার কেনার আহ্বান জানিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন, ভোটের ফল প্রকাশের পর তাঁরা লাভ করার সুযোগ পাবেন! আজ পর্যন্ত সরকারে আসীন কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মুখে এ ধরনের কথা শোনা যায়নি, যাওয়ার কথাও নয়। কারণ, শেয়ার বাজার নিয়ে পরামর্শ দেওয়ার কাজ তাঁদের এক্তিয়ারে পড়ে না। ফলে সঙ্গত কারণেই এ প্রশ্ন না উঠে পারে না যে, তাহলে কি এক্সিট পোলে ইচ্ছাকৃতভাবেই বিজেপির জয় নিয়ে মিথ্যা প্রচারের ষড়যন্ত্র হয়েছিল যাতে শেয়ার বাজার চড়ে গিয়ে কিছু বিশেষ বিনিয়োগকারীর দেদার মুনাফা হয়! তাতে ছোট কিছু বিনিয়োগকারীকে না হয় ক্ষতির শিকার হতে হল! এ ধরনের 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ' তো হয়েই থাকে!

এ কথা ঠিক, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দিনে দিনে যত বেশি সংকটগ্রস্ত মুমূর্ষু হয়ে পড়ছে, শেয়ার বাজারে ফাটকা কারবারের ততই রমরমা হচ্ছে। দুনিয়া জুড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের কাজের সুযোগ কমার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল ভাবে কমছে তাদের ক্রয়ক্ষমতা। উৎপাদিত পণ্য গুদামে পচতে থাকায় উৎপাদন ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগে পুঁজিপতিদের উৎসাহ যত কমছে, ততই তারা পুঁজি বিনিয়োগের মরিয়া চেষ্টায় আরও বেশি করে শেয়ার বাজারকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, নানা কৌশলে তা থেকে মুনাফা লুটতে চাইছে। কিন্তু শেয়ার দরের এবারের এই নজিরবিহীন ওঠানামা তো সেই সাধারণ প্রক্রিয়ায় ঘটেনি। এর মধ্যে একটা গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত শেয়ারবাজার বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ মানুষ— সকলের মনেই জাগছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব এই কেলেঙ্কারির তদন্ত করে সত্য উদঘাটন করা। তা না হলে ষড়যন্ত্রের অংশীদার ও প্রতারক হিসাবে তাঁদের সম্পর্কে দেশবাসীর সন্দেহ ঘুচবে না।

(সূত্র ঃ ডেকান হেরাল্ড-৯ জুন, দ্য ওয়্যার ৯ ও ১০ জুন, স্ক্রোল ডট ইন-৭ জুন ও আদানি ওয়াচ-১৯ জুন ২০২৪)

বিপুল মুনাফার লক্ষ্যে যাত্রী নিরাপত্তায় চরম অবহেলা রেল কর্তৃপক্ষের

নিউ জলপাইগুড়ির কাছে রাঙাপানি স্টেশনে ১৭ জুন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে যাত্রী নিরাপত্তায় ভারতীয় রেলের চরম অবহেলার তীব্র নিন্দা করে এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দাশগুপ্ত ১৮ জুন এক বিবৃতিতে বলেন,

রেল কর্তৃপক্ষ যথারীতি মৃত চালককেই এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করে নিজেদের অপদার্থতা চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নাম কা ওয়াস্তে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছেন। সর্বোপরি, মৃত ও আহতদের পরিবারের জন্য রেল কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণের যে পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, তা অতি সামান্য।

তিনি বলেন, নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি ও আধুনিকীকরণের নামে কিছুদিন বাদে বাদেই যাত্রীভাড়া বাড়ানো হচ্ছে, অথচ বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বছরের পর বছর ধরে ভারতীয় রেলে যাত্রীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা অবহেলিত হয়ে আসছে। দশকের পর দশক ধরে রেল দফতরের বিপুল সংখ্যক স্থায়ী পদ শূন্য পড়ে রয়েছে। পর্যাপ্ত কর্মীর অভাবে ট্রেন-চালক সহ রেলের অন্যান্য কর্মীদের উপর কাজের বিপুল চাপ। বিরতি ছাড়াই রাতের পর রাত দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে তাঁরা বাধ্য হন, যার ফলে তাঁদের ও যাত্রীদের প্রাণের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

ভারতীয় রেলের প্রধান লক্ষ্য হল যে কোনও মূল্যে বিপুল মুনাফা করা। বর্তমানে রেল দফতরের বড়কর্তাদের কাছে সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও সময়ানুবর্তিতার কোনও প্রাসঙ্গিকতাই নেই। সামগ্রিক খরচ কমাতে এমনকি বারোমেসে কাজগুলিকেও কন্ট্র্যাক্টর বা বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে যাদের উপযুক্ত দক্ষতা নেই। এআইইউটিইউসি দাবি জানিয়েছে— নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে, বিন্দুমাত্র দেরি না করে সমস্ত শূন্য পদ পূরণ করতে হবে ও সমস্ত বিভাগের প্রযুক্তিবিষয়ক কর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, মৃত ও আহতদের পরিবারপিছু যথাক্রমে ৩০ লক্ষ ও ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং ভারতীয় রেলের বেসরকারিকরণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

সরকারি মদতে আলুর দাম বাড়ছে

একের পাতার পর

একজন কৃষিমন্ত্রী আছেন। আছেন কৃষি-বিপণন মন্ত্রী। তাঁদের ভূমিকা কী? মূল্য নিয়ন্ত্রণে তাদের কোনও ভূমিকাই মানুষ দেখছে না। আসলে সরকারি দলের নেতা-মন্ত্রীদের মদতেই বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে এই ব্যবসায়ী চক্র। রাজ্য সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য যে টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে সেখানেও রয়েছে এই ব্যবসায়ী চক্রের মাথারা। ফলে এই টাস্ক ফোর্স কালোবাজারির কারবারি বা মজুদারদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে পারে না, করার ইচ্ছেও তাদের থাকে না।

তাহলে জনগণের সামনে পথ কী? সরকার যদি মূল্যবৃদ্ধির সংকট থেকে মানুষকে বাঁচানোর কোনও চেষ্টাই না করে তবে জনগণের সংগঠিত প্রতিবাদই একমাত্র রাস্তা। প্রয়োজন আলু, সবজি সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলন। এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) রাজ্য জুড়ে সেই আন্দোলনেই নেমেছে।

এমএসপি ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের মিথ্যাচার

একের পাতার পর

৩০১২ টাকা। সরকার দাম ধার্য করেছে কত টাকা? ২৩০০ টাকা। অর্থাৎ ৭১২ টাকা কম। একইভাবে জোয়ার, বাজরা, মুগ ডাল, তুলা ইত্যাদি ফসলের ক্ষেত্রে দাম যথাক্রমে ১০৬৬ টাকা, ২৭৯ টাকা, ২২৭৪ টাকা ও ২২২৪ টাকা কম ধার্য করেছে। অর্থাৎ কৃষকদের বেঁচে থাকার জন্য স্বামীনাথন কমিশন যে সুপারিশ করেছিলেন এবং ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে নরেন্দ্র মোদি যে দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়েছিলেন, তার তুলনায় অনেক কম টাকা ধার্য করা হয়েছে।

আর একটা কথা। টাকার অঙ্কে কিছুটা বাড়িয়ে বিজেপি সরকার তাকেই কৃষক দরদের নমুনা হিসাবে মানুষের সামনে হাজির করছে। কিন্তু সার-বীজ-তেল-বিদ্যুতের দাম যে ওরা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তার ফলে চাষের খরচ যে অনেক বেড়ে গেছে সেই বিষয়টা ধূর্ত বিজেপি নেতারা হিসাবের মধ্যে ধরার প্রয়োজন অনুভব করেননি। ভেবেছেন কৃষকরা ওদের এই চালাকি ধরতে পারবে না। তা ছাড়া জীবনধারণের অন্যান্য উপকরণের দামও যে রকেটের গতিতে বেড়েছে এ কথা বলাই বাহুল্য। ফলে প্রকৃত আয় বৃদ্ধির কথা যদি আমরা বিবেচনায় রাখি তাহলে কৃষকের আয় বাস্তবে কমেছে। এই বাস্তব অবস্থা একমাত্র গায়ের জোর ছাড়া বিজেপি সরকার কোনও মতেই অস্বীকার করতে পারবে না।

কৃষকদের অভিজ্ঞতা হল, এই সরকার বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর, আদানি-আম্বানিদের পোষা গোলাম। তাই কৃষকরা যদি লাভজনক দাম পায় এবং জনগণ যদি সস্তা দরে খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সরকারি ব্যবস্থাপনায় পায়, অর্থাৎ যদি সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু হয়, তাহলে এই সব হাঙর একচেটিয়া পুঁজিপতিদের খাদ্য-ব্যবসা বন্ধহয়ে যাবে। তা করার ক্ষমতা কি এই সরকারের নেই?

করতে গেলে সরকারি ক্ষমতায় ওরা একদিনও টিকে থাকতে পারবে না। ফলে জনগণকে প্রতারণা করা ছাড়া ওদের উপায় কী? কিন্তু কৃষকরা এই প্রতারণা মেনে নেবে না। এই প্রতারণার যোগ্য জবাব এই দেশের কৃষকেরা একদিন দেবেই। ইতিমধ্যে সংগ্রামী কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস দিল্লিতে সর্বভারতীয় কৃষক সমাবেশের ডাক দিয়েছে সেপ্টেম্বর মাসে। এই উপলক্ষে দেশ জুড়ে চলছে ব্যাপক প্রচার।

হিন্দুত্বের বিবেক ছেড়ে
জাতির বিবেক সাজার চেষ্টা মোহন ভাগবতের

নরেন্দ্র মোদির ঔদ্ধত্যের কথা কি হঠাৎ জানতে পারলেন আরএসএস প্রধান! সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করার মতো কথার স্রোত যে গোটা লোকসভা নির্বাচন পর্ব ধরে চলেছে তা কি আরএসএস প্রধান জানতেও পারেননি? আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের মুখনিঃসৃত বাণী শুনলে কারও এমনটা মনে হতেও পারে। সম্প্রতি তিনি আরএসএসের শিক্ষানবিশদের নিয়ে একটি বৈঠকে বলেছেন, প্রকৃত সঙ্ঘসেবক যিনি, তিনি নিজের কাজ করেন, কিন্তু কত কাজ করেছেন তা নিজের মুখে কখনও উচ্চারণ পর্যন্ত করেন না। আরও বলেছেন, শাসক এবং বিরোধী দুই পক্ষই নির্বাচনী প্রচারে এমন কথা বলেছে যাতে সমাজে বিভেদের সৃষ্টি হয়, এটা উচিত নয়। বলেছেন, 'ভোটের সময় মর্যাদা রক্ষা করা হয়নি'। তাঁর কথায়, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিরোধী হিসাবে নয়, দেখা উচিত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। অন্যত্র তিনি বলেছেন, অন্য দলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের বিজেপিতে আশ্রয় দেওয়া উচিত হয়নি।

শুনে মনে হতে পারে, মোহন ভাগবতজি তথা আরএসএসের হলটা কী? আরএসএস কি সত্যিই বিজেপির এই সমস্ত কার্যকলাপে অনুমোদন দিচ্ছে না? কিন্তু যত দিন ধরে নির্বাচনী প্রচারে এই সমস্তগুলি চলল, তার মধ্যে একটিবারও মোহন ভাগবতজি তাঁর সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন না কেন? যদিও এবারের নির্বাচনের কথাই বা উঠছে কেন, ২০০২-এর গুজরাট গণহত্যা থেকে শুরু করে একেবারে ২০২৪-এর নির্বাচন পর্যন্ত দেখলে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক, মোহন ভাগবতজি কি জেগে ঘুমোচ্ছিলেন, না হঠাৎ করে এমন বোধোদয়ের পিছনে তাঁর বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য আছে!

ঘটনাপ্রবাহ কিন্তু দ্বিতীয় সম্ভাবনাটির দিকেই ইঙ্গিত করছে। ২০১৪-তে বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতায় আসার পর থেকে গো-রক্ষার অজুহাতে একের পর এক মানুষ হত্যার ঘটনা মোহন ভাগবতজি হয় দেখতে চাননি, অথবা এ বিষয়ে তাঁর অনুমোদন ছিল বলে নীরব থেকেছেন। বিজেপির নেতারা যখন 'গোলি মারো শালো কো' বলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন, দিল্লি দাঙ্গায় ইন্ধন দিয়েছেন, নরেন্দ্র মোদি নিজে যখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে বলেছেন, 'পোশাক দেখলেই অপরাধী চেনা যায়' ভাগবতজির পবিত্র কানে এ সব পৌঁছতে পারেনি। রহস্যটা কী?

ভাগবতজি কি জানতেন না যে তাঁর সংগঠন আরএসএসের পরম প্রিয় সেবক নরেন্দ্র মোদির পৃষ্ঠপোষকতায় বিলকিস বানোর ধর্ষক এবং তাঁর সন্তান ও আত্মীয়দের খুনিদের ব্রাহ্মণত্বের দোহাই পেড়ে মালা পরিয়েছে সংঘ পরিবারেরই লোকজন? কোথায় নারীর মর্যাদা ভাগবতজি? ভাগবতজি, আপনি ভাষার মর্যাদা লঙ্ঘিত হয়েছে বলে দুঃখিত? আপনার সংঘের দীর্ঘ দিনের সেবক নরেন্দ্র মোদি ভারতের আন্দোলনরত কৃষকদের আন্দোলনজীবী, খালিস্তানি, টুকরে টুকরে গ্যাংয়ের সদস্য বলে ব্যঙ্গ করেছেন, জানতেন না আপনি? মোহন ভাগবতজি কি উত্তরাখণ্ড এবং দিল্লি থেকে জারি হওয়া সংঘ ঘনিষ্ঠ সাধুদের ঘৃণা ভাষণের বিরুদ্ধে কোনও দিন কিছু বলেছেন? নাকি তখন ভেবেছিলেন এতে যদি বিজেপির ভোট বাড়ে ক্ষতি কী? ভয় ছিল যে ওই সময় 'কথার মর্যাদা' রক্ষার চেষ্টা করতে গিয়ে পাছে সরকারি গদির সুফলটা হাত ছাড়া হয়, মন্ত্রী-সান্ত্রী পরিবেষ্টিত হয়ে দেশের গার্জেন সেজে ভাল মন্দ উপদেশ দেওয়ার সুযোগটা যদি ফস্কে যায়! আদানি, আম্বানি, বিড়লাদের টাকার থলির বদ্যান্যতায় ঘাটতি পড়ে যায়! এ জন্যই কি সে দিন শিকেয় তোলা ছিল আপনার 'মর্যাদা'!

ভেঙে ফেলা বাবরি মসজিদের জমিতেই গড়া অযোধ্যার রাম মন্দিরের সামনে মোদিজির শুয়ে পড়ার দৃশ্যটা আর একবার দেখে নেবেন নাকি মোহন ভাগবতজি? আপনি নিশ্চয়ই জানতেন ভাগবতজি, সেখানে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে যে প্রকল্পটার নির্মাণ সুপরিকল্পিত ভাবে করা হচ্ছিল তার নাম চরম উগ্র হিন্দুত্ব! আর তার সাথে ঝরে পড়া বিজেপি তথা সংঘ পরিবারের নেতাদের চরম ঔদ্ধত্য চোখে না পড়ে উপায় আছে? তাতে কি আপত্তি ছিল না আপনার? এই রাম মন্দিরের উদ্বোধনকেই যখন ভারতের 'নতুন স্বাধীনতা দিবস' বলে অভিহিত করলেন নরেন্দ্র মোদি— মোহন ভাগবতজি আপনি কোনও আপত্তি জানিয়েছিলেন নাকি? গোটা রাম মন্দির ইভেন্টটাই যে আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক, কোনও রকম ধর্মীয় অনুষঙ্গ এতে নেই— মোহন ভাগবতজি এবং তাঁর আরএসএসের কাছে তা অজানা ছিল নাকি? আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে ভাগবতজি, অযোধ্যার অসম্পূর্ণ রাম মন্দিরের উদ্বোধনে গিয়ে আপনি বলেছিলেন, নরেন্দ্র মোদির একার তপস্যায় এটা সম্ভব হয়েছে। এ রকম তপস্যা আমাদের সকলকে করতে হবে। কীসের তপস্যা ভাগবতজি? কাশী-মথুরায় মন্দির-মসজিদ বিতর্কে ইন্ধন দিয়ে নতুন করে দাঙ্গার আগুন জ্বালানোর তপস্যা? ভাগবতজি আপনার এবং আপনাদের সংঘ পরিবারের অনুমোদন ছাড়া বাবরি মসজিদ ধ্বংস থেকে শুরু করে এই পুরো ব্যাপারটা ঘটেছে নাকি? সমাজে বিভেদ সৃষ্টির এতবড় যজ্ঞের সহ-তপস্যী এবং অন্যতম হোতা আপনিও কি নন!

মোহন ভাগবতজি— আপনাকে আপনারই কয়েকটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাক বরং। ২০১৪-তে নরেন্দ্র মোদির কেন্দ্রীয় গদি লাভের কিছুদিন পরে মুম্বই-এর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে যোগদান করে আপনি বলেছিলেন, 'ভারত হিন্দু রাষ্ট্র। দেশের প্রতিটি হিন্দু পরিবারের মধ্যে সেই হিন্দু পরিচয়ের আত্মশ্লাঘা জাগিয়ে তুলতে হবে। ভারতের সংস্কৃতির সনাতন আচারই হল হিন্দুত্ব' (বর্তমান, ১৯ আগস্ট, ২০১৪) এরই কয়েকদিন আগে কটকে গিয়ে আপনি বলেছিলেন, 'হিন্দুস্তানের গভীরে একটাই ধর্ম প্রোথিত আছে। সেটি হল হিন্দুত্ব' (ওই)। সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর নয় কি?

মোহন ভাগবতজি আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আপনার সংঘের প্রেরণায় লিখিত গুজরাটের স্কুল পাঠ্য বই 'প্রেরণাদীপ'-এ লেখা হয়েছে যে, গঙ্গায় মেশার পর কোনও স্রোতের কোনও আলাদা সত্ত্বা থাকতে পারে না। তাই যারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে মিশ্র সংস্কৃতি বলে তারা সঠিক নয় (প্রেরণাদীপ বইয়ের 'শিক্ষণ নু ভারতীয়করণ' অংশ— পৃঃ ১৫)। আপনি এখন সব ধর্ম-বর্ণের মানুষকে সাথে নিয়ে চলার কথা বলছেন! আশ্চর্য!

মোহন ভাগবতজির গুরুদেব গোলওয়ালকর সাহেবের কথায়—'হিন্দুস্তানের সমস্ত অহিন্দু মানুষ হয় হিন্দুর ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করবে ও পবিত্র বলে জ্ঞান করবে, হিন্দু জাতির গৌরবগাথা ভিন্ন অন্য কোনও ধারণাকে প্রশ্রয় দেবে না। ... এক কথায় তারা হয় বিদেশি হয়ে থাকবে, না হলে হিন্দু জাতির দেশে তারা থাকবে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের অধীনস্থ হয়ে, কোনও দাবি ছাড়া, কোনও রকম সুবিধা ছাড়া ও কোনও রকম পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা ছাড়া। এমনকি নাগরিক অধিকারও তাদের থাকবে না' (উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড, পৃঃ ৫২)। কী বোঝা গেল?

আরএসএস-এর চিন্তার মধ্যেই আছে এই বিদ্বেষের বিষ। তাদেরই রাজনৈতিক শাখা হিসেবে বিজেপিকে এই বিদ্বেষ বিষ দেশে ছড়ানোর কাজে বেছে নিয়েছে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, দারিদ্র জর্জরিত জীবনে জনগণ যাতে প্রতিবাদের পথে না হাঁটে, তাদের দুর্দশার জন্য আসল দায়ী পুঁজিপতি শ্রেণির বদলে জনগণ যেন অপর ধর্ম, অপর জাত-বর্ণের মানুষকেই নিজেদের শত্রু বলে ভাবে, এটাই হল আসল পরিকল্পনা। এ দেশের শাসক শ্রেণির পরিকল্পনার ভিত্তিতেই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্বেষের চাষ করে চলেছে আরএসএস। তাদের হয়ে রাজনীতিতে এই বিদ্বেষ এনেছে বিজেপি। সমাজে এই বিদ্বেষ, এই অমর্যাদার পরিবেশ আরএসএস তৈরি করে রেখেছে বলেই স্বাধীনতার পর থেকে খেটে খাওয়া মানুষের ঐক্যকে ভাঙতে কখনও কংগ্রেস, কখনও জাতপাত ভিত্তিক নানা দল তাকে কাজে লাগাতে পেরেছে। আজ বিজেপি সে দায়িত্ব আরও বেশি দক্ষতার সঙ্গে পালন করে চলেছে।

মোহন ভাগবতজি আসলে কী চেয়েছেন? বিজেপি যখন রামমন্দির, মঙ্গলসূত্র কেড়ে নেওয়া ইত্যাদি নানা উস্কানিতে হিন্দু-মুসলমান বিভেদের জিগির তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেও সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের রোষের আগুন পুরোপুরি চাপা দিতে ব্যর্থ, তিনি তখন ভাল ভাল জনমোহিনী কথা বলে আরএসএস-বিজেপির কুকর্মের ওপর একটা মিষ্টি প্রলেপ লাগাতে চাইছেন। তাঁর ভাবখানা দেখে মনে হতে পারে কোনও শিশু ভুল করলে যেমন অভিভাবকরা ছদ্ম গাম্ভীর্যে বকুনি দেন, তেমন করেই তিনি নরেন্দ্র মোদিকে ভুল ধরাচ্ছেন! আসলে এতদিন যে ভাবে মোদিজিকে প্রায় অবতারের পর্যায়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিল আরএসএস-বিজেপি, সে বেলুন চুপসে গেছে। তাই এখন তিনি নিজেই দেশের বিবেক সাজতে চেয়েছেন। যদি তাতে বিজেপির ক্ষতি কিছুটা মেরামত করা যায়! এ জন্যই এত উদার তিনি! হিন্দুত্বের শ্রীমুখ ছেড়ে তিনি এখন জাতির বিবেক এবং অভিভাবক সেজে বিদ্বেষের রাজনীতিকেই মানুষের রোষ থেকে একটু আড়াল করতে চান। নরেন্দ্র মোদির ভেকের মতোই এটা তাঁর নতুন ভেক। তবে মানুষ যে সহজে এতে ভুলছে না, এ বারের নির্বাচনে তা কিছুটা হলেও দেখা গেছে। খেটে খাওয়া মানুষকে সাবধান থাকতে হবে এই ভেকধারিদের কৌশল যাতে তাঁদের দৃষ্টিকে গুলিয়ে দিতে না পারে।

ঝাড়খণ্ডে বিরসা মুন্ডা স্মরণ ছাত্রদের

৯ জুন এআইডিএসও-র উদ্যোগে উলগুলান বিদ্রোহের মহানায়ক বিরসা মুন্ডা শহিদ দিবস পালিত হয় ঝাড়খন্ডের পশ্চিম সিংভুম, জামশেদপুর, রাঁচি, সরাইকেলা সহ বিভিন্ন স্থানে।

বর্ধিত ন্যূনতম মজুরি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে ইন্দোরে মিছিল

মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হাইকোর্টের একটি অন্তর্বর্তী রায়ের অজুহাতে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির হার আকাশছোঁয়া হলেও বিগত দশ বছর বিজেপি সরকার তা বাড়ায়নি। এবারে বাড়িয়েও তা প্রত্যাহার করা হল। এর প্রতিবাদে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত জেএএইচ ঠিকা সাফাই কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শতাধিক শ্রমিক ইন্দোর শহরের হাজিরা চৌরাস্তা থেকে শ্রমবিভাগের লেবার কমিশনারের অফিস পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হন। সংগঠনের ইন্দোর জেলা সম্পাদক রূপেশ জৈনের নেতৃত্বে লেবার কমিশনারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

হরিয়ানায় পরিবার পরিচয়পত্রের নামে
হয়রানি বন্ধের দাবি এসইউসিআই(সি)-র

হরিয়ানায় বিজেপি সরকার সমস্ত পরিবারকে ‘পরিবার পরিচয়পত্র’ তৈরি করার জন্য যেভাবে চাপ দিচ্ছে তার তীব্র প্রতিবাদ করেছে এস ইউ সি আই (সি) হরিয়ানা রাজ্য কমিটি। ১৯ জুন দলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়,

এই পরিচয়পত্রকে পারিবারিক আয়ের সাথে যেভাবে জোড়া হচ্ছে তাতে পরিবারগুলির পক্ষে সরকারি সাহায্য পেতে পরে অসুবিধা হতে পারে। পরিবারগুলির আয় সবসময় এক থাকে না। একবার কোনও একজন সদস্য কিছু বাড়তি আয় করলেই সরকারি সমস্ত সাহায্য থেকে পরিবারটি পুরোপুরি বাদ পড়বে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আধার কার্ড থাকা সত্ত্বেও এই নতুন পরিচয়পত্রের জন্য মানুষকে এভাবে হয়রানি করা অর্থহীন। দলের পক্ষ থেকে এই পরিচয়পত্রের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে।

পানীয় জলের দাবিতে
পাঁশকুড়া পৌরসভায় নাগরিকদের বিক্ষোভ

পাঁশকুড়া পৌরসভা এলাকায় তীব্র পানীয় জলসঙ্কট দূর করার দাবিতে পাঁশকুড়া পৌরসভা দফতরে বস্তি উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে ১৪ জুন বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচিতে সামিল হন এলাকার মানুষ।

নারান্দা ওভারহেড ট্যাঙ্ক থেকে যে জল ১নং, ২নং, ৩নং ও ৫নং ওয়ার্ডে সরবরাহ করা হত, তা প্রায় এক মাস যাবৎ বন্ধ রাখা হয়েছে। এর ফলে এলাকায় তীব্র পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে মেদিনীপুর ক্যানেলের উভয় পার্শ্বে যে সকল গরিব মানুষ বসবাস করেন, যাঁদের দিনমজুরির কাজ করে সংসার চলে, নির্দিষ্ট সময়ে জল না পাওয়ায় এই গরমে তাঁদের সঙ্কট অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। একাধিকবার পৌরসভায় জানানো সত্ত্বেও এর কোনও সমাধান হয়নি। ফলে প্রায় দুই শতাধিক মহিলা সহ নাগরিকেরা পৌরসভা দফতরে এ দিন বিক্ষোভ দেখান ও চেয়ারম্যানকে ডেপুটেশন দেন।

এতে নেতৃত্ব দেন কমিটির সম্পাদক কার্তিক বর্মন, দীপঙ্কর মাইতি, সিক্তা মাজী প্রমুখ। চেয়ারম্যান অতি দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন।

মূল্যবৃদ্ধি এবং নিট ও নেটে দুর্নীতির বিরুদ্ধে
কৃষ্ণচন্দ্রপুর বাজারে প্রতিবাদ মিছিল

২৩ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এসইউসিআই(সি) -র কৃষ্ণচন্দ্রপুর-নালুয়া-লালপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে কৃষ্ণচন্দ্রপুর বাজারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিট ও নেট পরীক্ষায় পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন গত লোকসভা নির্বাচনে দলের প্রার্থী কমরেড বিশ্বনাথ সরদার, কমরেড গুণসিন্ধু হালদার, লোকাল সম্পাদক কমরেড লক্ষ্মণ মণ্ডল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ভর্তিতে হয়রানি বন্ধ, নিট-নেট দুর্নীতির তদন্তের দাবিতে ছাত্রবিক্ষোভ কলকাতায়

রাজ্যে উচ্চ-মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের ৪৫ দিন পর আন্দোলনের চাপে স্নাতক স্তরে ভর্তির জন্য ২৪ জুন পোর্টাল চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্য জুড়ে গোটা ব্যবস্থাটি বিপর্যস্ত হয়ে যায়। বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী চরম অসুবিধায় পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক পোর্টাল চালু করে দুর্নীতিমুক্ত ভাবে ভর্তির ব্যবস্থা, দুর্নীতি দমনে কঠোর ব্যবস্থা ও পাশ করা সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর স্নাতক স্তরে ভর্তি হতে পারার দায়িত্ব সরকার কর্তৃক গ্রহণের দাবিতে এআইডিএসও-র ডাকে ২৪ জুন শিয়ালদহ চত্বরে ছাত্র-বিক্ষোভ মিছিল হয় এবং মৌলালি মোড় অবরোধ করা হয়। এরই সঙ্গে নিট ও নেট দুর্নীতির তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিট-ইউজি-র কাউন্সেলিং বন্ধ রাখা, ইউজিসি ও সিএসআইআর নেট পরীক্ষার দিন ঘোষণা করা ইত্যাদি দাবি তোলা হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে কুশপুতুল দাহ করা হয়।

এক নজরে

ভারতে ৫ বছরের নিচে শিশুদের ৪০ শতাংশই ভুগছে অপুষ্টিতে ঃ রিপোর্ট ইউনিসেফের

জিডিপি বৃদ্ধির দাবি নিয়ে ঢাক পেটাচ্ছে মোদি সরকার। অথচ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংস্থা ইউনিসেফের রিপোর্টে উঠে এসেছে ভারতে শিশু অপুষ্টির করুণ চিত্র।

নতুন ‘চাইল্ড ফুড পভার্টি’ রিপোর্টে সারা বিশ্বজুড়ে পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত দুর্দশার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বে প্রায় ১৮ কোটি ১০ লক্ষ শিশু পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টির অভাবে ভুগছে। এই শিশুদের ৬৫ শতাংশই ২০টি দেশের বাসিন্দা। এই তালিকায় চিন, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশের মতো প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে রয়েছে ভারতও। অর্থাৎ ভারতও একটি বড় অংশের শিশুদের মুখে জোগাতে পারছে না পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য।

ইউনিসেফের পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট, সারা বিশ্বের প্রতি চারজন শিশুর মধ্যে ১ জনই (২৭ শতাংশ) খাদ্য ও পুষ্টির চরম অভাবে ভুগছে। ৯২টি দেশে সমীক্ষার ভিত্তিতে ইউনিসেফের এই ‘চাইল্ড ফুড পভার্টি’ রিপোর্ট। এই রিপোর্ট অনুসারে, বেলারুশে উপযুক্ত খাদ্য বঞ্চিত শিশুর হার ১ শতাংশ। সেখানে সোমালিয়ায় এই হার ৬৩ শতাংশ। ভারতে ৪০ শতাংশ। রিপোর্ট অনুসারে, ভারতের ওই শিশুদের পরিস্থিতি গুরুতর পর্যায়েই পড়েছে।

রিপোর্টে সতর্ক করে বলা হয়েছে, গুরুতর শিশুখাদ্য সমস্যা অপুষ্টি ডেকে আনছে। আর যে সব দেশে ‘স্টান্টিং’য়ের সমস্যা রয়েছে, সেখানে খাদ্য সঙ্কটের আওতায় থাকা শিশুর সংখ্যা তিন গুণ বেশি। মূলত অপুষ্টির কারণে শিশুদের বয়স অনুযায়ী উচ্চতা না বাড়লে সেই সমস্যাকে ‘স্টান্টিং’ বলে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সমীক্ষায় পাঁচ বছরের কম শিশুদের ৩৫.৫ শতাংশের স্টান্টিংয়ের কথা জানানো হয়েছিল।

* * *

দেশে নারী নির্যাতনে শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ

জাতীয় মহিলা কমিশনের পরিসংখ্যান বলছে, মহিলারা সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন উত্তরপ্রদেশে। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত সারা দেশে ১২ হাজার ৬৪৮টি নানা ধরনের নারী নির্যাতনের অভিযোগে জমা পড়েছে কমিশনে। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ৬ হাজার ৪৯২টি অভিযোগ জমা পড়েছে উত্তরপ্রদেশ থেকে। দ্বিতীয় স্থানে দিল্লি। সেখানে অভিযোগের সংখ্যা ১ হাজার ১১৯টি। তৃতীয় স্থানে আরও এক বিজেপি শাসিত রাজ্য মহারাষ্ট্র। একনাথ শিন্ডের রাজ্য থেকে জমা পড়েছে ৭৬৪টি অভিযোগ। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা ৩০৭। ঘরে বাইরে নির্যাতনের শিকার হন মহিলারা। রিপোর্টেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। এর মধ্যে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে না পারার অভিযোগ সাড়ে তিন হাজারের বেশি (৩ হাজার ৫৬৭)। দ্বিতীয় স্থানে পারিবারিক হিংসার শিকারের অভিযোগ (৩ হাজার ২১৩)। পণ নিয়ে হয়রানি (১ হাজার ৯৬৩) এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগও (৮২১) রয়েছে। ধর্ষণ এবং ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ জমা পড়েছে ৬৫৮টি। (সূত্র ঃ বর্তমান ২০ জুন ২০২৪)

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বুলডোজারের চাকায় পিষ্ট সাধারণ মানুষ

কৃষিকাজের প্রয়োজনে ১৯২৩ সালে আমেরিকায় বুলডোজার ব্যবহারের নকশা যাঁরা প্রস্তুত করেছিলেন তাঁরা এর এত অভিনব প্রয়োগের কথা কল্পনাও করেননি। তখন তো যোগী আদিত্যনাথ কিংবা শিবরাজ সিং চৌহান, মোহন যাদবের মতো বিজেপির বাঘা বাঘা মন্ত্রীরা ছিলেন না! গত কয়েক বছর ধরে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বিরোধী কণ্ঠ দমনের নামে ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলতে, দোকান কিংবা বস্তিবাসীদের ঝুপড়ি উচ্ছেদে এই যন্ত্রকে ক্রমাগত ব্যবহার করে চলেছেন শাসক বিজেপি দলের নেতারা। ফলে বুলডোজার এখন গরিব মানুষ উচ্ছেদের এক অভিনব যন্ত্র।

সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের মণ্ডলা জেলার আদিবাসী ও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এক গ্রামে বিরাট পুলিশবাহিনী কয়েকটি বাড়ির ফ্রিজ থেকে উদ্ধার করে গোমাংস, একটি বাড়ি থেকে পশুর চর্বি ও চামড়া, একজনের উঠোন থেকে দেড়শো গরু। পুলিশি অভিযানের পর তড়িঘড়ি এফআইআর দায়ের, মাংসের ডিএনএ পরীক্ষা, অভিযুক্তদের ধরপাকড় ইত্যাদি চলে। পরদিনই যে সব বাড়িতে গোমাংস পাওয়া গেছে সেই সব বাড়ি বেছে বেছে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

মধ্যপ্রদেশ একটানা ১৭ বছরের বেশি বিজেপি শাসিত। স্বভাবতই উগ্র হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী এই দলটি মধ্যপ্রদেশে পশুহিংসা প্রতিরোধ আইন ও গো-বধ নিবারণী আইনের মতো দুটি কড়া আইন চালু করেছে। কত বড় গো-প্রেমী তা বোঝাতে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বিজেপি নেতা মোহন যাদব ২০২৪ সালকে 'গোবংশ রক্ষাবর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এ হেন রাজ্যে বুলডোজার দিয়ে সংখ্যালঘু, জনজাতি মানুষের গ্রামকে গুঁড়িয়ে দেওয়া 'বেআইনি' কাজ হতে পারে কি? সেখানে তো মানুষ-বধ নিবারণী কোনও আইন চালু করা হয়নি! কিংবা গো-রক্ষার অজুহাতে মানুষ খুনের বিরুদ্ধেও কোনও নিষেধাজ্ঞা সংঘ পরিবারের তরফে আনা হয়নি!

রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানার অসংখ্য স্থানে গো-হত্যা বা গো-মাংস খাওয়ার অভিযোগে বহু সাধারণ মানুষ ও পশু ব্যবসায়ীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে চলেছে ধর্মোন্মাদ গো-রক্ষক বাহিনী। ধর্মে-বর্ণে মানুষকে ভাগ করে এবং সংখ্যালঘু বিদ্বেষ ছড়িয়ে সংখ্যাগুরু ভোটব্যাঙ্ক তৈরিই যে বিজেপির একমাত্র উদ্দেশ্য, তাদের লাইসেন্স ছাড়া তথাকথিত গো-রক্ষা বাহিনী আকছার এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারত কি? মধ্যপ্রদেশের ওই গ্রামে হঠাৎ কিছু মানুষ গো-মাংস ভক্ষণ ও সংরক্ষণ শুরু করেছেন, এমন নয়। এটা তাদের জীবন-জীবিকারই অঙ্গ। জবলপুরের দীর্ঘকালের জুতোর ব্যবসার সঙ্গেও তা জড়িত। এটা স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসন জানে না, এমনও নয়। এ ছাড়া সুপ্রিম কোর্ট সহ একাধিক আদালতের রায় আছে যে, চাইলেই কোনও মানুষের ঘরবাড়ি সরকার ভেঙে দিতে পারে না। কিন্তু শাসক দলের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডাই যেখানে পুলিশের আসল দণ্ডসংহিতা, সেই বিজেপি শাসিত রাজ্যে এটাই আইন!

২০১৫-য় উত্তরপ্রদেশে গো-মাংস রাখার অপরাধে মহম্মদ আখলাককে পিটিয়ে মেরেছিল গো-রক্ষক বাহিনী। রাজস্থানের আলোয়ারে গো-হত্যার অভিযোগে পিটিয়ে এক পশুব্যবসায়ীকে হত্যা করেছিল তারা। একজন দুষ্কৃতীও শাস্তি পায়নি। উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে বুলডোজার দিয়ে চরম দমন-পীড়ন শুরু করেন। এই সুবাদে তাঁর নামকরণ হয় 'বুলডোজার বাবা'। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় 'চ্যাম্পিয়ন' সাজতে আদিত্যনাথ বলেছিলেন, গুণ্ডা-মাফিয়া, জমি-দখলকারীদের জন্য 'জিরো-টলারেন্স' নিয়ে চলবে তাঁর বুলডোজার। কারও কারও আশা ছিল, নারী নির্যাতনকারী, অবৈধ উপায়ে টাকা লেনদেনে অভিযুক্ত দুষ্কৃতী বা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ইন্ধন জোগানো ব্যক্তির ক্ষেত্রে বুলডোজার ব্যবহার করবে সরকার, মানুষ কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবে। কিন্তু কোথায় কী? বেছে বেছে দলিত, জনজাতি এবং সংখ্যালঘু এলাকার মানুষের বিরুদ্ধে, কিংবা বিরোধী-স্বর দমন করার জন্য বুলডোজারের ব্যাপক প্রয়োগ করছে সরকারের পেটোয়া পুলিশ-প্রশাসন এবং পুর কর্তৃপক্ষ। দেখা যাচ্ছে, দুষ্কৃতী নয়, বিজেপি সরকারের বুলডোজার তাক করা রয়েছে গরিব-অসহায় মানুষদের দিকেই।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধী দলগুলিকে যোগী আদিত্যনাথকে মডেল করতে বলেছিলেন। যোগীজি ভোটে 'বুলডোজার বাবা' পরিচয়ে নতুন অবতার সেজেছিলেন। মধ্যপ্রদেশের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব তাঁকে 'মডেল' করেছেন। মধ্যপ্রদেশের নানা স্থানে বুলডোজার চালিয়ে বস্তি উচ্ছেদ করে শিবরাজ সিং চৌহান পরিচিতি লাভ করেছিলেন 'বুলডোজার মামা' বলে। মধ্যপ্রদেশে বুলডোজারে বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়ার সাম্প্রতিক ঘটনায় দোষীদের শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রী যাদব মন্তব্য করেছেন— রাজ্য থেকে সব উপদ্রব ও দুর্বৃত্ত নির্মূলে সক্ষম সরকার। অর্থাৎ আদিবাসী ও সংখ্যালঘু গরিব মানুষ মানেই দুর্বৃত্ত!

সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের মানুষ বুলডোজার বাবা তথা বিজেপিকে ভোটে ধাক্কা দিয়েছেন। কিন্তু বিজেপি নেতাদের উপায় নেই। তাদের দল তথা সরকারের এমন কোনও কীর্তি নেই যা দেখে মানুষ তাদের সমর্থন করতে পারে। একটি অস্ত্রই তাদের আছে, তা হল গো-রক্ষার নামে সাম্প্রদায়িক বিভেদে উস্কানি দিয়ে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করা।

বাঙ্গালোরে বিক্ষোভ

১৯ জুন কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার কর্তৃক পেট্রল ও ডিজেলের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে বাঙ্গালোরের ফ্রিডম পার্কে এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে এক বিক্ষোভ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন বাঙ্গালোর উত্তর জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড ভি জ্ঞানমূর্তি এবং বাঙ্গালোর দক্ষিণ জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড এম এন শ্রীরাম। সভাপতিত্ব করেন উত্তর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড এ শান্তা।

ফ্রান্সে অতি দক্ষিণপন্থী শক্তিকে রুখে দেওয়ার আহ্বান ফুটবলার এমবাপের

"ফুটবলার হতে পারি, তবে আমরা সবার আগে দেশের নাগরিক। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই বলে থাকেন ফুটবলের সঙ্গে রাজনীতিকে মিশিয়ে ফেলা ঠিক নয়। কিন্তু আমরা ফ্রান্সের পরিস্থিতি থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারি না।"—সম্প্রতি দেশের যুবসমাজকে সরাসরি চরম দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে এই কথা বললেন বিশ্বখ্যাত ফুটবলার কিলিয়ান এমবাপে। খেলার মাধ্যমে প্রভূত খ্যাতি ও অর্থের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শুধু সেই ক্ষুদ্র জগতে বন্দি হয়ে না থেকে সমাজ-রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে উচ্চ মূল্যবোধের পরিচয় দিলেন তিনি।

৩০ জুন ও ৭ জুলাই ফ্রান্সে দু'রাউন্ডের নির্বাচন হতে চলেছে। এই নির্বাচনে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ন্যাশনাল র‍্যালির নেত্রী মারিন লে পেন। ন্যাশনাল র‍্যালি একটি অতি দক্ষিণপন্থী দল। তার শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে বিগত ১০ বছরে। উগ্র জাতীয়তাবাদের নামে দেশের ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী এই দক্ষিণপন্থী শক্তির সাম্প্রতিক কার্যকলাপে ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন জাতি ও আফ্রিকান বংশোদ্ভূত ফরাসি নাগরিক প্রবলভাবে উদ্বিগ্ন। সম্প্রতি ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিপর্যয়কর ফলাফলের পর মাকরঁ জাতীয় পরিষদ ভেঙে দেন। তাঁর সময়ে দেশের আর্থিক দুরবস্থা, অভিবাসন নীতি, ইউক্রেনে সৈন্য পাঠানো প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে নাগরিকদের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। জনপ্রিয়তা হারান মাকরঁ। এই সুযোগ নিয়ে ফ্রান্সে মাথা তুলতে শুরু করে অতি দক্ষিণপন্থী শক্তি। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নির্বাচনে তারা বিপুল সাফল্য পায়। কিন্তু নির্বাচনে দক্ষিণপন্থী এই শক্তির উত্থানে দেশের চিন্তাশীল, মানবতাবোধ সম্পন্ন মানুষ যে বিচলিত তা বিভেদকামী, ফ্যাসিবাদী নীতির পৃষ্ঠপোষক অতি দক্ষিণপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের অসংখ্য মানুষকে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখানোর ঘটনায় সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে।

বিপজ্জনক এই শক্তির উত্থান কী ভাবে দেশের সর্বস্তরের মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলতে পারে তা এমবাপের মন্তব্যেই পরিষ্কার। গ্রুপ ডি ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগের দিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফরাসি অধিনায়ক তার অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়ে বললেন, 'আমি কিলিয়ান এমবাপে যে কোনও চরম মতের বিরোধী। যা মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে, সেই ভাবনারও বিরোধী। আমি ফ্রান্সের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছি, এর জন্য গর্ববোধ করি। তাই আমি এমন কোনও দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই না, যারা আমার বা আমাদের মনুষ্যত্বের গুরুত্ব দেবে না।' এর কয়েকদিন আগে ফ্রান্সের আর এক ফরওয়ার্ড মারকাস থুরাম বলেছেন, 'আমাদের প্রতিদিন লড়তে হবে, যাতে ন্যাশনাল র‍্যালি ক্ষমতায় না আসে।' থুরাম-এর এই বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে এমবাপে আরও বলেন, 'অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধেফ্রান্সের ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু খেলার চেয়েও দেশের ভবিষ্যৎ বেশি জরুরি।' স্বাভাবিক সময়ে সরাসরি রাজনীতির কথা না বললেও সংকটকালে একজন খেলোয়াড়েরও যে নীরব থাকা উচিত নয়, তাও তিনি মনে করিয়ে দেন।

ফ্রান্সের সংকটজনক মুহূর্তে, যখন উগ্রপন্থী শক্তি দরজায় কড়া নাড়ছে, যখন মানবতা ও মূল্যবোধ বিপন্ন তখন তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর যে আহ্বান ফরাসি ফুটবল দলের অধিনায়ক দেশের যুবসমাজের কাছে রাখলেন তা সকলের কাছে অবশ্যই দৃষ্টান্তস্বরূপ। কোনও মানুষই রাজনীতির উর্ধ্বে নন, প্রত্যক্ষ রাজনীতি না করলেও বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলি প্রতিনিয়ত মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করে। এই সত্যকে অস্বীকার করে নিরপেক্ষতার নামে এক শ্রেণির মানুষ সমাজে ঘটে যাওয়া অন্যায় থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেন, তখন এমবাপের বক্তব্য অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

কিছুদিন আগে ভারতে মহিলা কুস্তিগীরদের উপর যৌন হেনস্থার প্রতিবাদে আন্দোলনের সামিল হতে দেখা গিয়েছিল বেশ কয়েকজন প্রথম সারির কুস্তিগিরকে। এই আন্দোলনে সমর্থনে সরব হয়েছিলেন আরও কয়েকজন ক্রীড়াবিদ। ডাক্তার, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী সহ বহু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিশিষ্ট নাগরিক এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এলেও সকলেই সেই ভূমিকা নিতে পারেননি। অথবা আজ যখন আমরা দেখছি পূর্বতন কংগ্রেসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমানে বিজেপি ক্ষমতায় থেকে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িকতা ও বিভেদের বাতাবরণ সৃষ্টি করে চলেছে, শিক্ষা- সংস্কৃতি-মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে ফ্যাসিবাদি চিন্তার প্রসার ঘটাচ্ছে এবং একজন সমাজ সচেতন বিবেকবান মানুষ হিসেবে আমরা আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারছি না, তখন অবশ্যই এমবাপের বক্তব্য আমাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ।

পাঠকের মতামত

সেমেস্টার প্রথা আপত্তিকর

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে শিক্ষক অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ থাকলেও সেই আইন মেনেই রাজ্যের তৃণমূল সরকার 'রাজ্য শিক্ষানীতি ২০২৩'-এর মধ্য দিয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে চালু করেছে সেমেস্টার প্রথা। এতদিন কলেজ স্তরে চালু থাকলেও এ বার উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলস্তরেও এই শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হচ্ছে এই প্রথা। ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডিএসও সহ বিভিন্ন স্তরের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও বুদ্ধিজীবী মহল এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুললেও তার কোনও তোয়াক্কা করেনি দুই সরকারই।

ঠিক কী কী অসুবিধা এই সেমেস্টার প্রথায়? প্রথমত, এই প্রথার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের যথার্থ, সুসংহত জ্ঞান অর্জনই সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীদের মনে পরীক্ষা ও নম্বর কেন্দ্রিক মানসিকতা এর মধ্যে দিয়ে বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয়ত, সেমেস্টার প্রথার মধ্যে একটি বছরকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি সেমেস্টারে একটি করে পরীক্ষা হবে। প্রতি ছ' মাস ১৮০ দিন হলেও নানা রকম ছুটিছাটার কারণে ক্লাস করার সুযোগ থাকে মাত্র ৮০-৮৫ দিন। এর ফলে ক্লাস শুরু হতে না হতেই একজন শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা প্রস্তুতির জন্য তৈরি হতে গিয়ে সিলেবাসের প্রতিটি বিষয়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। আবার, প্রথম ছ'মাসে শিক্ষার্থী যা শিখবে পরের ছ'মাসে শিক্ষণীয় বিষয় তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর আগে বছরে একটি পরীক্ষা হত। মাঝে কয়েকটি ইউনিট টেস্ট হত। এতে শিক্ষার্থী বছরের শুরুতে যা শিখছে শেষে তা পুনরায় আরেকবার ঝালিয়ে নিতে পারত। এতে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক শক্তির বিকাশের কিছুটা হলেও সুযোগ ছিল। কিন্তু সেমেস্টার প্রথায় সময়ের অভাবে বিষয়ভিত্তিক সামগ্রিক গভীর জ্ঞান শিক্ষার্থীদের পাওয়ার সুযোগ থাকছে না। দ্রুত সিলেবাস শেষ করতে গিয়ে অনেক বিষয় চাপা পড়ে যাবে। শুধুমাত্র পরীক্ষায় নম্বর তুলতে হবে এটি শিক্ষার্থীর চিন্তার মধ্যে গেঁথে যাচ্ছে। এবং পরের সেমিস্টারে গিয়ে আগের সেমেস্টারে কী পড়েছে তা মনে থাকবে না।

তৃতীয়ত, এই সেমেস্টার প্রথায় থাকছে এমসিকিউ অর্থাৎ মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন। কয়েকটি উত্তর দেওয়া থাকবে, সঠিক উত্তরটির পাশে টিক দিতে হবে। ধরে নেওয়া যাক, দেওয়া হল ভূগোল শাস্ত্রের জনক এরোটোস্থেনিস-কে বলা হয়। শিক্ষার্থী এখানে সঠিক উত্তরের পাশে টিক দেবে। কিন্তু কী কারণে তাঁকে ভূগোল শাস্ত্রের জনক বলা হয়, তাঁর জীবনের সংগ্রাম প্রভৃতি যদি শিক্ষার্থী বাক্য গঠনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে খাতায় লেখে তা হলে শিক্ষার্থীর ভাষায় দক্ষতা, মানসিক জ্ঞান এবং বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে। সেটাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং শিক্ষা সিলেবাস সম্পর্কে সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। অনেকে বলেন, শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটা নম্বর পাচ্ছে, সেটাই যথেষ্ট। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য কি শুধু নম্বর পাওয়া, নাকি ভাষায় প্রকাশ করার মাধ্যমে চিন্তার বিকাশ হওয়া?

পঞ্চমত, মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্সের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের কোনও রকম শৃঙ্খলা আর থাকছে না। অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান অপরদিকে পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অঙ্ক এই বিষয়গুলি পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু এখন আর তা থাকছে না। ধরুন একাদশ শ্রেণিতে কোনও ছাত্র ইতিহাস ভূগোল এর সাথে অঙ্ক, সঙ্গীত এই বিষয়গুলি নিয়েছে। সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অপছন্দের বলে নিল না। ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞান সহযোগী করে ইতিহাসের যে গভীর জ্ঞান গড়ে উঠতে পারত এতে তা আর হবে না।

ষষ্ঠত, উচ্চমাধ্যমিক বোর্ড পরীক্ষার মতো স্কুলশিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটিও থাকছে না। যদিও বলা হয়েছে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির চারটি সেমেস্টার মিলে উচ্চ মাধ্যমিকের নম্বর দেওয়া হবে।

সপ্তমত, বহু স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় ক্লাসরুম নেই, নেই শিক্ষক ও যথেষ্ট পরিকাঠামো। আট বছর ধরে রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিকে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষাই হয়নি। ফলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে এ রকম একটি সিলেবাস শেষ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

অষ্টমত, প্রতি সেমেস্টারে দিতে হবে ভর্তির ফি, পরীক্ষার ফি। অর্থাৎ বাড়বে অতিরিক্ত ফি-এর বোঝা। বহু ছাত্র-ছাত্রী আছে তারা আর্থিক সঙ্গতির অভাবে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। অর্থাৎ শিক্ষা আর সবার জন্য থাকছে না। অর্থের বিনিময়েই মিলবে শিক্ষা, যা ইতিহাসগত ভাবে অনৈতিক। শিক্ষা হওয়া উচিত অবৈতনিক, গণতান্ত্রিক। ফলে সেমেস্টার সিস্টেম শিক্ষার সার্বজনীন চরিত্র যেটুকু টিকে আছে তাও ধ্বংস করবে।

এই সেমেস্টার প্রথায় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে কেউ অনেক নম্বর পেতে পারে পরীক্ষার পর পরীক্ষা পাস করে অনেক বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করতে পারে। কিন্তু যথার্থ জ্ঞান, যথার্থ শিক্ষা এই প্রথার মধ্য দিয়ে পাওয়া সম্ভব কি? আজ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বেশি বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্রদের জাতীয় স্তরে গড়ে ওঠা কোচিং মাফিয়াদের খপ্পরে পড়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খোয়াতে হচ্ছে। এই শিক্ষা সিলেবাস পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের ছাত্ররা যন্ত্রে পরিণত হবে। সরকারের উচিত শিক্ষার সাথে যুক্ত শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীমহলের মতামত নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক সিলেবাস পদ্ধতি চালু করা, যা যথার্থই প্রগতিশীল শিক্ষা এবং যা মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

বুদ্ধদেব রায়
ক্ষুদিরাম সরণি, কোচবিহার

*

দুর্নীতি

দুর্নীতি ভারতীয় রাজনীতিতে একটা বেশ গরমাগরম বিষয়।

এক দলের নেতা-কর্মীরা অন্য দলের নেতা-নেত্রীদের নামে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। কিছুদিন হইচই চলে। অভিযোগ তোলার আগে কেউ কেউ আবার কোনও প্রমাণের ধার ধারেন না। চেষ্টা করেন অন্য দলের জনপ্রিয়তা কমাতে। ভারতীয় জনগণ একটা সময় সত্যি সত্যি দুর্নীতি নিয়ে ভীষণ চিন্তায় ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে ক্ষমতাচ্যুত করা গিয়েছিল বোফর্স কামান কেনার দুর্নীতির ঘটনা নিয়ে। এর আগেও নানা দুর্নীতিতে নেতারা জড়িয়ে পড়েছিলেন, কাউকে কাউকে পদত্যাগও করতে হয়েছিল। এমনকি কোনও কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও দুর্নীতির অভিযোগে জেলে গেছেন। বিহারের লালু প্রসাদের পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি, উত্তরপ্রদেশের মুলায়ম, মায়াবতীদের নামে দুর্নীতির ভুরিভুরি অভিযোগ আছে। একই রকম অভিযোগ ছিল জয়ললিতার নামেও। এ রাজ্যে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে। খালি সরকারি দলই নয় বিরোধী অনেক দলের মধ্যেও এরকম দুর্নীতির ঘটনাগুলো ঘটেছে।

কিন্তু মজার বিষয়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সদা ব্যস্ত রাজনৈতিক দলগুলি সম্মিলিতভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে রাজি নয়। তারা অন্য দলের দুর্নীতি নিয়ে চিৎকার করেন, পত্রিকায় বক্তব্য রাখেন, টিভিতে ভাষণ দেন। কিন্তু দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনও কড়া আইন আনতে বলুন, দেখবেন সব ভোটবাজ দলই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আবার আজ অন্য দলে যে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা আছেন তিনি দল পাল্টালেই ধোওয়া তুলসীপাতায় পরিণত হয়ে যান।

আজ অবধি কোনও সরকারি দলই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনও কড়া আইন আনার চেষ্টা করেননি। একই অবস্থা বিরোধী দলগুলোর, তারাও দুর্নীতি নির্মূল করার দাবিতে সরব হয়নি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লোকদেখানো আন্দোলন করা যায়, কিন্তু তার পূর্ণ অবসান কখনওই তারা চাইবে না। কারণ আজ দুর্নীতি ভোটসর্বস্ব সংসদীয় রাজনীতির অপরিহার্য অংশ হয়ে পড়েছে।

রবিব্রত ঘোষ
দুর্গাপুর

*

দুধের দাম

কোন দুধটা দেবো মাসিমা?

ওই ফুল ক্রিম গো, নাতনির জন্মদিনে পায়েস করব একটু।

দুধের প্যাকেট দুটো বেশ খুশি মনে বাজারের ব্যাগে ঢুকিয়ে নিতে নিতেই দাম শুনে মুখটা পাল্টে গেল ভদ্রমহিলার।

দু প্যাকেট দুধ ৬৮ টাকা! এই তো সেদিনও...

সেদিন আর নেই মাসিমা, দুধের দাম বেড়েছে শোনেননি?

বৃদ্ধার মুখ দেখে বুঝলাম তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি যে, একটু ভালো দুধ দিয়ে নাতনিকে পায়েস করে খাওয়ানোর সাধটুকুও আরও অনেক না মেটা সাধের মতোই কুলুঙ্গিতে তুলে রাখতে হবে এ বার। দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্যাকেট দুটো রেখে দিলেন বৃদ্ধা, হাত বাড়ালেন দুটো কম দামি প্যাকেটের দিকে।

তাঁর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে দোকানি বলল— খারাপ লাগে জানেন? কিন্তু কী করব বলুন আমাদের তো হাত-পা বাঁধা।

মনে মনে ভাবলাম, যাদের সত্যিই কিছু করার ছিল তারা যা করার তাই করেছেন। ভোট মিটতেই দুধের দাম বাড়িয়ে দেশের মানুষকে 'উন্নয়নের' প্রথম উপহারটি দিয়েছেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসের চড়চড় করে দাম বাড়তে থাকা নতুন কিছু নয়। তবু ভোটের ফল ঘোষণারও অপেক্ষা না করে যখন বড় বড় দুধের কোম্পানিগুলো অনায়াসে দাম বাড়িয়ে ফেলতে পারে, তখন বুঝতেই হয় এ পোড়া দেশে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের জীবনের দাম আছে শুধু ওই ভোটের বাক্সে। সরকারের অনুমতি এবং সমর্থন না থাকলে বড় বড় কোম্পানিগুলো যে এভাবে দাম বাড়াতে পারে না এ কথা আজ বাচ্চাও বোঝে।

ভোট মিটতেই ৪৮ ঘণ্টাও অপেক্ষা না করে দেশের সবচেয়ে বড় দুটো দুধ কোম্পানি আমূল এবং মাদার ডেয়ারি লিটার প্রতি দু' টাকা বাড়িয়ে ফেলল। পরপরই গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন দুধের দাম বাড়ালো। খবরে শুনি, কথায় কথায় বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা গুজরাটের ডবল ইঞ্জিন সরকারের কথা বলে গর্ব করেন, অথচ সে রাজ্যেও সাধারণ মানুষের অবশ্যপ্রয়োজনীয় এই পানীয়ের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার কোনও চেষ্টা চোখে পড়ল না।

২০২২-এ শুধু মার্চ থেকে ডিসেম্বরেই মাদার ডেয়ারির দুধের দাম বেড়েছে লিটার প্রতি ১০ টাকা। কাজেই আজ যা শুনতে মাত্র ২ টাকা মনে হচ্ছে তার ভার এবং যন্ত্রণা জানেন ওই বৃদ্ধার মতো মানুষগুলো। কোম্পানিগুলো দাম বাড়ার পক্ষে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া, কম উৎপাদন হওয়া, গরমের কারণে দুধ সংরক্ষণের সমস্যা, এইসব নানা অজুহাত দেখিয়েছে। এসব শুনলে মনে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। গরমের জন্যই যদি দুধের দাম বেড়ে থাকে, গরম কমলে কি দাম কমবে? অভিজ্ঞতা বলছে, কখনওই না।

নানা অজুহাতে দাম বাড়ালেও, পরিস্থিতি পাল্টালে জিনিসের দাম কমেছে এমন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া ভার। যদি উৎপাদনের অপ্রতুলতা বা উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া কারণ হয়ে থাকে, সরকার তার দায়িত্ব নিল না কেন? দুধ এমন খাবার নয় যা না হলেও চলে। একেবারে ছোট শিশু থেকে শুরু করে গুরুতর অসুস্থ মানুষ, বয়স্ক মানুষ— এদের জন্য সুষম খাদ্য হিসাবে দুধ যে কতখানি দরকারি, তা কি সরকারি কর্তাব্যক্তিরা জানেন না? ভোটের আগে জনসেবার প্রতিশ্রুতি যদি মিথ্যের ফুলঝুরি না হয়, তা হলে সরাসরি উৎপাদকদের কাছ থেকে ন্যায্য দামে কিনে কম দামে মানুষকে বিক্রি করা বা প্রয়োজনে ভর্তুকি দিয়ে দাম কমানোর কোনও চেষ্টাই কেন করল না সরকার? যে কোনও পরিস্থিতির মাশুল সাধারণ মানুষের উপর মূল্যবৃদ্ধি আর করের বোঝা চাপিয়ে আদায় করতে হবে, এই কি কোনও সভ্য রাষ্ট্রের চেহারা?

ফেরার পথে বৃদ্ধার করুণ মুখখানা মনে করে ভারি কষ্ট হচ্ছিল। বারবার মনে পড়ছিল নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোট গল্প 'এক পো দুধ'। বিনোদ আর লতিকার নিম্নবিত্ত সংসারে অনেক কষ্টে কেনা এক পো দুধের ভাগ নিয়ে অশান্তি লেগে থাকত। আজ স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পেরিয়েও দুধের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরেই থেকে গেল!

সূর্যস্নাতা সেন
কলকাতা ৭৭

রেল দুর্ঘটনা ঃ ব্যর্থতা আড়ালের চেষ্টা

একের পাতার পর

বয়ান তাঁদের পর্দা ফাঁস করে দিয়েছে। খবরে প্রকাশ, পরপর চারদিন নাইট ডিউটি করার পর পঞ্চম দিনে চালককে ঘুম থেকে তুলে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। এ ঘটনা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। গোটা রেল দপ্তরে চলছে অসহনীয় অরাজকতা। প্রাণ যাচ্ছে সাধারণ মানুষের। কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে নেতা, মন্ত্রীরা ফুলে ফেঁপে উঠছেন। বাস্তবে কী ঘটছে? রেলে ব্যাপক কর্মী সংকোচন হচ্ছে। ১৯৭৪ সালে যেখানে রেলে সাড়ে বাইশ লাখ শ্রমিক কাজ করতেন, আজ সেখানে কর্মীসংখ্যা দশ লাখের কাছাকাছি। অথচ ১৯৭৪ সালের পরে রেলের যাত্রী পরিবহণ, মাল পরিবহণ, ট্রেন, মালগাড়ি ও স্টেশনের সংখ্যা বেড়েছে বহুগুণ। সেফটি ক্যাটিগরিতেও ব্যাপক কর্মী সংকোচন হচ্ছে। গার্ড, ড্রাইভার, স্টেশন মাস্টার, গ্যাংম্যান, সিগন্যাল স্টাফ, ওভারহেড তার মেরামত করার কর্মী, টিকিট পরীক্ষক সহ এমার্জেন্সি স্টাফদের ওপর ব্যাপক চাপ বাড়ছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কোনও ছুটি পাওয়া যাচ্ছে না। কাজের সময়ের কোনও সীমা থাকছে না। প্রতিবাদ করলেই চার্জশিট, সাসপেনশন, রিমুভ্যাল, ডিসমিস্যাল অর্থাৎ ছাঁটাই।

রেলে এক মধ্যযুগীয় আইন আছে— ১৪/২, যাতে কোনও তদন্ত ছাড়াই যে কোনও রেলকর্মীকে ডিসমিস করে দেওয়া যায়। এই আইনবলে তাঁকে সারা জীবনের জন্য সমস্ত রকম চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যায়। বছরকয়েক আগে খড়গপুর ডিভিশনে শুধু মাত্র ছুটি না পাওয়ার কারণে এক ড্রাইভার আত্মহত্যা করেন। তার প্রতিবাদ করার জন্য আটজন ড্রাইভারকে ১৪/২ ধারায় অভিযুক্ত করে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হয়। কাজের চাপজনিত কারণে গত ১৫ জুন গোয়ালিয়র স্টেশনে একজন প্রধান টিকিট পরীক্ষক সহ দুজন টিকিট পরীক্ষক চলন্ত ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছেন। কয়েক মাস আগে সেন্ট্রাল রেলে কয়েক জন কর্মী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন। ওয়ার্কশপগুলোতে যে পরিমাণ কর্মী দুর্ঘটনায় পড়ে আহত হচ্ছেন বা মারা যাচ্ছেন তাদের খবর কেউ রাখে না। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বেসরকারিকরণের নজিরবিহীন আক্রমণ। যেসব রেল ইঞ্জিন, কোচ ওয়াগন, যন্ত্রাংশ রেলের নিজস্ব কারখানায় তৈরি হত, যেখানে গুণমান নিয়ে কোনও সমঝোতা করা হত না, সেগুলি আজ বাইরের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সরকারি ইলেকট্রিসিটি মার্কেটিং পোর্টাল (জেম)-এর মাধ্যমে কেনা হচ্ছে। চলছে কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যাপক কাটমানির কারবার। রেলের নিজস্ব ইন্সপেকশন ব্যবস্থাকে ঠুঁটো করে রেখে দেওয়া হয়েছে। মেরামতির সব কাজ বেসরকারি মালিকদের দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কম পারিশ্রমিকে অদক্ষ শ্রমিক দিয়ে ঠিকাদাররা সেই কাজ করিয়ে নিচ্ছে। তাতে একদিকে চলছে নির্মম শ্রমিক শোষণ। অপরদিকে গুণগত মান নিচে নেমে যাচ্ছে। মালগাড়িগুলির ওয়াগন এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেসরকারি। সেখানে মুনাফার লোভে রেললাইনের সহনসীমার অতিরিক্ত মাল পরিবহণ করে রেলপথকে বিপজ্জনক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। একই ট্রেনকে রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ না দিয়ে বিভিন্ন রুটে চালানো হচ্ছে। এ রকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। এ সবই ঘটছে রেলের কর্তাব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। রেল শ্রমিকরা প্রতিবাদ করলে শাস্তির খাঁড়া নেমে আসছে।

রেলযাত্রায় সুরক্ষা ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করতে অ্যান্টি কলিশন ডিভাইসের কথা শোনা গেছে বিজেপি ক্ষমতায় আসার বহু আগেই। বিজেপি সরকার এসে ঘটা করে তার নাম দিয়েছে 'কবচ'। কিন্তু তার জন্য টাকা বরাদ্দ এতই কম যে ১০ বছরে অতি সামান্য রেলপথেই তা বসেছে। দুর্ঘটনা প্রতিরোধে অন্যান্য আধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থার হালও তাই।

রেলের আধুনিকীকরণ মানে যে স্টেশনে শপিং মল তৈরি আর বন্দে ভারত চালানো নয়, বিজেপি সরকার সেই সরল সত্যটা আদৌ বোঝে কি না সন্দেহ। রেল তাদের কাছে মুনাফার হাতিয়ার মাত্র। জনমুখী দৃষ্টি তথা যাত্রীস্বার্থকেই প্রাধান্য দেওয়ার বদলে মুনাফার দৃষ্টিভঙ্গিতে রেলকে দেখার ফলেই রেলের সামগ্রিক পরিকাঠামো তৈরি এবং পরিচালনায় চূড়ান্ত সমন্বয়ের ঘাটতি হচ্ছে। যার মাশুল দিতে হচ্ছে যাত্রী ও নিচুতলার রেল কর্মীদের।

দার্জিলিং-এর রাঙাপানিতে রেল দুর্ঘটনায় কর্তৃপক্ষকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে ২০ জুন এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিল এবং রেলমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কমরেডস তন্ময় দত্ত, জয়ন্তী ভট্টাচার্য, মানী রায়, জয় লোধ, শোভা কার্যী প্রমুখ।

শ্রমিকের প্রাণের মূল্য

দুর্ঘটনা। আপাত অর্থে যাকে দুর্ঘটনা বলে মনে হয়, তার সবই কি তা? হ্যাঁ কিছু নিশ্চয়ই থাকে যা শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতির বিচারে দুর্ঘটনাই। কিন্তু যেসব ঘটনাগুলিকে সাধারণভাবে আমরা দুর্ঘটনা বলে উল্লেখ করি তার বেশির ভাগই শেষ বিচারে অন্য কথা বলে।

কেন এমন বলছি? মনে করুন, কুয়েতের ওই জতুগৃহের কথা। বাইরে থেকে দেখলে ঝাঁ চকচকে বহুতল মনে হয়। আসলে তা লেবার ক্যাম্প। ভিনদেশি প্রায় ২০০ জন শ্রমিক নির্মাণকর্মী হিসেবে দক্ষিণ কুয়েতের ম্যানগ্রাফ শহরের ছ'তলা ওই বিল্ডিং-এ থাকত। অগ্নিকাণ্ডে এদের মধ্যে অন্তত ৪৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে, এর মধ্যে প্রায় ৪০ জন ভারতীয়। কেন ওই স্বল্প পরিসরে গাদাগাদি করে তারা থাকত? ইচ্ছে করে নিশ্চয়ই নয়। সরকারি বিবৃতিতে কুয়েত প্রশাসন জানিয়েছে এ দিন যা ঘটেছে, তা রিয়েল এস্টেট মালিকের অতিরিক্ত লোভের ফল। বাড়তি মুনাফার লোভে এমন গাদাগাদি করে নিজের সংস্থার কর্মচারীদের রাখার ফলেই এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটেছে।

কেউ বলবেন অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনা ও মৃত্যু কি অন্যত্র কোথাও ঘটে না? হ্যাঁ ঘটে। কিন্তু গাদাগাদি করে থাকার ফলে সময়মতো নিরাপদ স্থানে বেরিয়ে পড়ার সুযোগ ছিল না ওই শ্রমিকদের। অভিযোগ, এক একটি ঘরকে বহুজনের ব্যবহার উপযোগী করতে যে পার্টিশন দেওয়া হয়েছিল, তাও দহনের সহায়ক বস্তু হিসেবে কাজ করেছে। এতগুলি মানুষের এমন বেঘোরে প্রাণহানি ঘটতই না যদি মানুষগুলো মানুষের মতো সুষ্ঠুভাবে থাকার সুযোগ পেত। ওই মালিকের বাড়িতে এমন দুর্ঘটনার কথা কেউ কখনও শুনেছে নাকি? সেখানে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা, সদা সতর্কতা। আসলে ধনতন্ত্রে প্রাণের মূল্যও নির্ধারিত হয় অর্থ ধন সম্পত্তির মালিকানার উপর ভিত্তি করে। সমাজই উৎপাদনে সত্যিকার অর্থে কোনও ভূমিকাই যাদের নেই, শুধু অর্থ প্রতিপত্তির মালিক বলে তাদের প্রাণ মহামূল্যবান। বহু যত্নে সাজানো গোছানো তাদের জীবন। আর হাড়ভাঙা খাটুনিতে প্রতিদিন যারা তিলে তিলে গড়ে তুলছে এ সভ্যতাকে, তাদের প্রাণের দাম কানাকড়িও নয়। এই যে নিয়মিত রেল দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটছে, প্রতিটি ঘটনার পর শোনা যায় নাকি তার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তাতে কী লাভ হয়? যে প্রযুক্তি (কবচ) ব্যবহার করে দুর্ঘটনাকে কমিয়ে ফেলা বহু অংশে সম্ভব সেই প্রযুক্তির ব্যবহার অবহেলিতই থেকে যাচ্ছে দিনের পর দিন। নিরাপত্তার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজও পরিচালিত হচ্ছে কায়িক শ্রমে। তাই কার ভুলে কী হল— দোষারোপ চলছে। সামান্য কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরকার প্রতিবার তার দায় এড়াচ্ছে। আর কর্মী সংকোচন ঘটিয়ে যত কম সম্ভব কর্মী দিয়ে রেল চালাচ্ছে। লোকো পাইলট না স্টেশন মাস্টার কার ত্রুটি— এ আলোচনায় সত্যি কি সমস্যার সমাধান হবে? মানুষের প্রতি যে হীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই ব্যবস্থাটা চলছে তার দিকে আঙুল উঠবে কবে?

এ পৃথিবীতে যত মিনার সৌধ সড়ক রেলপথ শহর বন্দর গড়ে উঠেছে ও নিয়ত পরিচালিত হচ্ছে, তার ভিত্তিমূলে রয়েছে হাজার হাজার শ্রমিকের অমূল্য প্রাণ। সে কথা কে-ই বা মনে রাখে। যে মালগাড়ির সাথে মেল ট্রেনের ধাক্কা লেগে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল, সেই মালগাড়ির চালককে টানা চার রাত ডিউটির পর ঘুম থেকে তুলে আবার ডিউটি করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই চূড়ান্ত অমানবিক অব্যবস্থার মাশুল দিলেন নিজের প্রাণ দিয়ে, সাথে ঝরে গেল আরও কত অমূল্য প্রাণ। কলকাতার ধাপার ঢিপির উপরে নতুন পল্লীর বাসিন্দা শ্যামাপদ মণ্ডল তেমনই আর একজন শ্রমিক। মেট্রো প্রকল্পের নিরাপত্তা কর্মীর দায়িত্বে থাকা ৫৫ বছরের শ্যামাপদর রোজগারের ওপরই মূলত নির্ভর করে ছিল তাঁর অনেক সদস্যের সংসার। সারা রাত ডিউটির শেষ পর্যায়ে ভোর রাতে চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে চোখটা সবে একটু বুজে আসছিল, তখনই আচমকা হুড়মুড়িয়ে তাকে ধাক্কা মারে একটি ক্রেন। মুহূর্তেই সব শেষ। দায় কার, দোষ কার—বিশ্লেষণ চলবে। সামান্য কিছু ক্ষতিপূরণে হয়তো মুখবন্ধ হয়ে যাবে হতদরিদ্র পরিবারের। কিন্তু আমি আপনি, যারা নিজেদের সচেতন বিবেকবান মানুষ বলে মনে করি, এ সব ঘটনাগুলি দেখে কাগজের পাতা উল্টে চলে যাব নিত্যনৈমিত্যিক সাধারণ ঘটনা বলে? যে সমাজব্যবস্থা মানুষের প্রাণের মূল্য এ ভাবে কানাকড়িতে বিকিয়ে দিতে পারে, মানুষকে মানুষ জ্ঞান না করে পশু স্তরে নামিয়ে আনতে পারে, সে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত হৃদয় কি গর্জে উঠবে না? মরমি কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হৃদয় এই হতদরিদ্র মানুষগুলির দুর্দশায় একসময় কেঁদেছিল। লিখেছিলেন— 'আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা, তোরা মর। কিন্তু যে সভ্যতা তোদের এমন ধারা করিয়াছে, বইতেই যদি হয় তো সেই সভ্যতাকে রসাতলের পানে বহিয়া নিয়া যা।' কথাশিল্পীর এ আর্তিকে বাস্তবায়িত করার সময় কি আজও আসেনি? আমি আপনি কি নীরব দর্শকের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে ধনতান্ত্রিক এই সমাজব্যবস্থাকে রসাতলে নিয়ে যাওয়ার পথে পা মেলাতে পারি না? যে ব্যবস্থায় অনাহারে অপুষ্টিতে বিনা চিকিৎসায় মানুষের মৃত্যুমিছিল বাড়ে, অর্থনৈতিক সামাজিক চাপে ক্লিষ্ট পিষ্ট হতে হতে আত্মঘাতী হওয়ার প্রবণতা বাড়ে, সাধারণ জীবনের মূল্য যেখানে শূন্য হয়ে যায়, সে ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা ছাড়া পথ আর কীই বা থাকতে পারে?

আমরা কি নতুন সেই সমাজ সৃষ্টির স্বপ্ন দেখতে পারি না যে সমাজটা মেহনতি মানুষেরই? সমাজের চোখে যেখানে প্রতিটি মানুষই অনন্ত সম্ভাবনার উৎস? হ্যাঁ, এমন সমাজেরও উদাহরণ আছে এ পৃথিবীতে। ৭০ বছরের সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া স্থাপন করেছে সে ইতিহাস। তারা দেশের মাটি থেকে নির্মূল করেছিল বেকারসমস্যা, শোষণ, লোভ, পতিতাবৃত্তি। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার শ্রমিক কৃষকদের দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুধু স্বক্ষেত্রে শ্রমদানই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির আঙিনাতেও এই শ্রমিক-কৃষকদের গড়ে উঠেছিল স্বচ্ছন্দ বিচরণ। সামাজিক ধারণাটা ছিল এরকম— মানুষ তার নিজ ক্ষেত্রে যথাসাধ্য শ্রমদান করে রাষ্ট্রকে নির্মাণ করবে, আর রাষ্ট্র তার সাধ্য অনুযায়ী মানুষের সুস্থ সবল সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনগুলি পূরণ করবে। মুছে গিয়েছিল হাজার হাজার বছরের বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার ইতিহাস। এ তো কোনও কল্পকাহিনী নয়। মার্ক্সবাদকে ভিত্তি করে দুনিয়ার সবহারা মানুষের মুক্তি সংগ্রামের মহান নেতা কমরেড লেনিন ও কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষই রক্তে ঘামে ভিজে নির্মাণ করেছিল এ ইতিহাস, কায়েম করেছিল শ্রমিক শ্রেণির রাজ। বাঁচার আনন্দে বাঁচতে হলে, মানুষের মতো বাঁচতে গেলে আজ ধনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের পথে সামিল হওয়া ছাড়া আমাদের সামনে দ্বিতীয় কোনও রাস্তা আছে কি?

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 76, No.: 45 Bengali Weekly June 28, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

নিটে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি

বিক্ষোভ সেভ এডুকেশন কমিটির

সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির আহ্বানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসের সামনে নিট ২০২৪ এর দুর্নীতির প্রতিবাদে ২০ জুন শিক্ষক, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ও ডাক্তার সহ শতাধিক শিক্ষাপ্রেমী মানুষ বিক্ষোভ দেখান।

সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির ডাকে নিট-নেট পরীক্ষা দুর্নীতির প্রতিবাদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ। ২০ জুন

সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক অমিতাভ দত্ত, সর্বভারতীয় সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক তরুণকান্তি নস্কর, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ডাঃ শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও সার্ভিস ডক্টর ফোরামের সহ-সভাপতি ডাঃ সুদীপ দাস। সভা থেকে দাবি ওঠে— এনটিএ পরিচালিত ২০২৪-র নিট পরীক্ষা বাতিল করে রাজ্য স্তরে মেডিকেল এন্ট্রান্স পরীক্ষা অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। অসংখ্য দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত এনটিএ সংস্থাকে বাতিল করতে হবে। দুর্নীতির দায় স্বীকার করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হবে এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক প্রদীপ দত্ত। সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ মিত্র জাতীয় শিক্ষানীতি ও এনটিএ-কে বাতিলের দাবিতে শিক্ষাপ্রেমী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানান। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষে ২৩ জুন এক বিবৃতিতে নিট সহ সাম্প্রতিক পরীক্ষা দুর্নীতির দায় নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগ দাবি করা হয়েছে এবং পরবর্তী পরীক্ষার দিন যত দ্রুত সম্ভব ঘোষণার দাবি জানানো হয়েছে। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমগ্র চিকিৎসক সমাজ এবং ডাক্তারি ছাত্রছাত্রীদের সরব হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

খেলার মাঠ বেসরকারি সংস্থাকে দেওয়ার প্রতিবাদ

গ্রেপ্তার এস ইউ সি আই (সি) নেতারা

কলকাতার তারাতলায় পোর্ট ট্রাস্টের অধীনস্থ দীর্ঘ ৮০ বছরের পুরনো সুবিশাল জৈনকুঞ্জ খেলার মাঠকে সম্প্রতি একটি বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পার্শ্ববর্তী আরেকটি খেলার মাঠও কয়েক বছর আগে সরকার সেঞ্চুরি সংস্থার হাতে তুলে দেয়। এলাকার বিভিন্ন স্কুল কলেজ সহ সমস্ত রকম খেলাধূলা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই এই দুটি মাঠ ব্যবহৃত হত। প্রথম মাঠটি বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার সময়ে এলাকার মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বর্তমানে জৈনকুঞ্জ মাঠটি একমাত্র খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহারের জন্য ছিল। এই মাঠটিও বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিয়ে চারপাশে দেওয়াল তুলতে গেলে এলাকার মানুষ প্রবল বিক্ষোভ দেখান। ২৩ জুন এলাকার পাঁচ শতাধিক মানুষ একত্রিত হয়ে প্রতীকী অবরোধ করেন। মাঠ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে ২৪ জুন পোর্ট ট্রাস্ট চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন ও শান্তিপূর্ণ অবস্থানের ডাক দেওয়া হয়। পাঁচ শতাধিক এলাকাবাসীর এই অবস্থানে নেতৃত্ব দেন এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী জুবের রব্বানি এবং কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অংশুমান রায় সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। অবস্থান চলাকালীন বিনা প্ররোচনায় পুলিশ জুবের রব্বানি ও অংশুমান রায় সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে লালবাজারে নিয়ে যায়।

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক সুব্রত গৌড়ী ২৪ জুন এক বিবৃতিতে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শান্তিপূর্ণ ভাবে অবস্থানরত নেতা-কর্মীদের ওপর যেভাবে পুলিশ আক্রমণ চালিয়েছে ও গ্রেপ্তার করেছে, আমরা তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে আন্দোলনের সমস্ত নেতা-কর্মীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানাচ্ছি। অবিলম্বে খেলার মাঠ এলাকার ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়ার দাবি করছি।

দিল্লিতে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলে স্পষ্ট

পাশ-ফেল প্রথা বিলোপ সরকারি শিক্ষাকে দুর্বল করেছে

১৫ বছর আগে ‘শিক্ষার অধিকার আইন— ২০০৯’ গালভরা নাম দিয়ে দেশ জুড়ে একটি সর্বনাশা নীতি চালু করা হয়েছিল। সেই আইন অনুসারে, যে কোনও শিশু বা বালক-বালিকা তার বয়স অনুসারে নির্দিষ্ট শ্রেণিতে ভর্তি হবে এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও পাশফেল থাকবে না। কোনও বিদ্যালয় কোনও ছাত্র বা ছাত্রীকে অটোমেটিক প্রোমোশন না দিলে, উক্ত আইন অনুসারে সেই বিদ্যালয় বা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা উক্ত ছাত্র বা ছাত্রীটির শিক্ষার অধিকারে ‘বাধা’ দিয়েছে ধরে নিয় তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

পাশফেল বিলোপের পক্ষে উক্ত মতের প্রবক্তাদের একটি প্রিয় যুক্তি হল, পাশফেল থাকলে ড্রপ-আউট বৃদ্ধি পায়, বাবা-মায়েরা আর তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে না পাঠিয়ে ছেলেদের কাজ করতে পাঠিয়ে দেয়, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয় ইত্যাদি। দেশে সরকার বদলেছে, রাজ্যে রাজ্যে সরকার বদলেছে, কিন্তু এই আইন বলবৎ রেখে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ‘বামফ্রন্ট সরকার’ বিগত শতাব্দীর আশির দশকের শুরুতেই প্রাথমিকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার পাশাপাশি পাশফেল প্রথাও বিসর্জন দিয়েছিল। এর ফলে বাংলা সহ অন্যান্য বিষয়েও ছাত্রছাত্রীরা দুর্বল হতে থাকে। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে ইংরেজি ফিরিয়ে আনা হলেও, পাশফেল প্রথা চালু করা হয়নি। ফলে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্জলি যাত্রা অব্যাহত থাকে। ২০০৯ সাল থেকে সেই পাশফেল প্রথা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তুলে দেওয়া হল। এর ফল কী দাঁড়িয়েছে? ২০১৩-১৪ সাল নাগাদ সরকার নিযুক্ত বিভিন্ন কমিটি তাদের রিপোর্টে ‘অটোমেটিক প্রোমোশনের’ কুফলের কথা তুলে ধরে। দেখা যায়, সরকারি বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণির ৬০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীই প্রথম শ্রেণির বই পড়তে পারছে না (হরিয়ানার শিক্ষামন্ত্রী গীতা ভুক্কলের নেতৃত্বাধীন সিএবিই কমিটির রিপোর্ট, ২০১৪)। কিন্তু ‘ড্রপ-আউটের’ কথা বলে পাশফেল প্রথাকে সরিয়েই রাখা হয়েছে।

অন্যান্য রাজ্যের মতো দিল্লিতেও সরকার পাশফেল প্রথা তুলে দিয়েছিল। শীলা দীক্ষিতের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের পর ২০১৩ সাল থেকে দিল্লিতে আম আদমি পার্টির সরকার রয়েছে। তারাও দিল্লিতে ‘নো-ডিটেনশন’ নীতি বলবৎ রাখে, যেমন এই রাজ্যেও তৃণমূল কংগ্রেস ২০১১ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকলেও পাশফেল ফিরিয়ে আনেনি। দিল্লি বা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন আম আদমি পার্টি বা তৃণমূল কংগ্রেস, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে নানা সময়ে হুঙ্কার ছাড়লেও তারা এই ‘সর্বনাশা নীতি’কে বলবৎ রেখেছে।

২০২২ সালে তৃতীয় শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়নের জন্য একটি নির্দেশিকা জারি করে দিল্লির আপ সরকার। সেই নির্দেশিকা অনুসারে, ছাত্রছাত্রীদের প্রতিটি বিষয়ে ৩৩ শতাংশ নম্বর পেতে হবে এবং যাণ্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় সামগ্রিকভাবে অন্ততঃ ২৫ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। প্রতিটি বিষয়ে ১০০ পূর্ণমানকে ভাগ করা হয়— উপস্থিতির জন্য ৫ নম্বর, বিষয় উৎকর্ষের জন্য ৫ নম্বর, প্রজেক্টের জন্য ৫ নম্বর, সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রমের জন্য ৫ নম্বর, মাল্টিপল অ্যাসেসমেন্টের জন্য ৫ নম্বর, ইউনিট টেস্টের জন্য ৫ নম্বর, অর্ধবার্ষিক মূল্যায়নের জন্য ২০ নম্বর এবং বার্ষিক মূল্যায়নের জন্য ৫০ নম্বর।

দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ শিশোদিয়ার মতে, ‘নো-ডিটেনশন নীতি’ খুবই প্রগতিশীল ছিল, কিন্তু উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি।

কিন্তু এর ফল কী দাঁড়াল? এই বছরে (২০২৩-২৪) অষ্টম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে ২০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী অর্থাৎ মোট ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৪৬,৬৬২ জন যোগ্যতামান পেরোতে পারেনি। গত বছরেই দিল্লি সরকার ঘোষণা করেছিল ৫ম এবং ৮ম শ্রেণিতে পরীক্ষার পাশাপাশি পাশফেলও থাকবে। এর পরেই এই বছরের এই চিত্রটি সামনে এল। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? এই অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা এতদিন অটোমেটিক প্রোমোশন পেয়ে এসেছে। পাশফেল না থাকায় পড়াশোনার সেই তাগিদটাই ছিল না। ফলে তাদের শিক্ষার বুনিয়াদটাই নড়বড়ে হয়ে গেছে। আজ তারা নো-ডিটেনশন নীতির কুফল ভোগ করছে।

সুতরাং, দিল্লির সরকার যতই ঝাঁ-চকচকে স্কুল তৈরি করুক না কেন, শিক্ষাদানের পদ্ধতিটাই যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তার ফলাফল খারাপই হবে। আজ দিল্লির মতো একটা ছোট রাজ্যে একটি শ্রেণি থেকে পরের শ্রেণিতে উঠতে গিয়ে যদি ৪৬ হাজার ছাত্রছাত্রী অনুত্তীর্ণ হয়, তবে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল দশা কতটা সেটা বোঝাই যাচ্ছে। আর সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা যতই ডুববে, ততই বেসরকারি স্কুল রমরমিয়ে উঠবে। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার অপমৃত্যুর জন্য ভাগাড়ের শকুনের মতো কর্পোরেট পুঁজি অপেক্ষা করছে।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com